# সুজুমে

মাকোতো শিনকাই

অনুবাদ : রৌণক বসাক

ভূমিপ্রকাশ

# প্রথম দিন

## স্বপ্নলোক

অদ্ভুত স্বপ্নটা বিগত দিনগুলোতে বেশ কয়েকবার আমার ঘুমের মাঝে ধরা দিয়েছে। আমার কাছে অবশ্য ওটা স্বপ্নের চাইতেও বেশি বাস্তব বলে মনে হয়। স্বপ্নে আমি নিজেকে পথভ্রষ্ট এক ছোট্ট বালিকা রূপে আবিষ্কার করি। কীভাবে যে পথ হারালাম, বুঝতে পারি না। অজানা আশঙ্কায় গলা শুকিয়ে আসে, তবুও অদ্ভুত এক আশ্বাসের বলয় যেন সর্বক্ষণ ঘিরে থাকে আমায়। অনেকটা নিজের প্রিয় চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকার মতো। একঘেয়ে, তবুও আরামদায়ক। স্বপ্নের ওই জগৎটা খুব অচেনা লাগে। মনের একটা অংশ বলে আমার ওখানে থাকাটা ঠিক নয়, আবার অপর অংশটা সারাজীবনের মতো ওখানেই থেকে যেতে চায়। বুকের ভেতর জমে থাকা দলাপাকানো কান্নাটা কোনোমতে চেপে রাখার চেষ্টা করি। কিন্তু লাভ হয় না, চোখের কোণে জন্ম নেয় স্বচ্ছ বালুকণার মতো অশ্রু।

মাথার ওপরে সমগ্র আকাশ জুড়ে তারাগুলো ঝিকিমিকি খেলা করে। কেউ যেন ভুল করে ওদের ঔজ্জ্বল্য দশগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। এত আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে যায়। মনে হয় যেন আলোর পাশাপাশি তারাগুলো একধরনের শব্দও ছড়িয়ে দিচ্ছে। সেই শব্দ, আমার নিঃশ্বাস, বাতাসের হাহাকার আর পদদলিত শুকনো আগাছার খচমচ শব্দ মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়; বারবার প্রতিধ্বনিত হতে থাকে কানের পর্দায়। পুরো সময়টা জুড়েই আমি ওই আগাছাদের মাঝখান দিয়ে হেঁটে চলি। বহুদূরে দিগন্তরেখার কাছাকাছি দেখা যায় সুউচ্চ পর্বতশ্রেণি। তার পেছনে সাদা ধবধবে মেঘের প্রাচীরের ফাঁক দিয়ে উঁকি দেয় সোনালি রঙের উজ্জ্বল সূর্য। দিনের সবকটা সময় যেন এখানে একই বিন্দুতে মিশে গিয়েছে। আমি হাঁটতে থাকি।

কিছুক্ষণ পর কোথা থেকে যেন আস্ত একটা বাড়ি উদয় হয় চোখের সামনে। আশেপাশে নজরে পড়ে একইরকম আরও কতগুলো বাড়ি। তাদের আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রয়েছে অজস্র লতাপাতা। বেশিরভাগ জানালা-ই ভাঙা। শতচ্ছিন্ন পর্দাগুলো উড়তে থাকে হাওয়ায়। একটা জানালা দিয়ে উঁকি দেওয়ার চেষ্টা করি। ঘরের ভেতর আগাছার দল গজিয়ে উঠেছে। তবে অদ্ভুতভাবে, ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বাসনপত্র, কীবোর্ড, বইখাতা আর অন্যান্য জিনিষগুলো দেখতে একেবারে নতুনের মতো লাগে।

চিৎকার করে ডাকতে যাই, "আম্মু!" কিন্তু মুখ দিয়ে কোনোরকম আওয়াজ বের হয় না। গলা পরিষ্কার করে পুনরায় চেঁচিয়ে উঠি, "আম্মু!" ঘরের আইভি রঙের দেওয়ালগুলো শুষে নেয় সেই ক্ষীণ কণ্ঠস্বর।

এক এক করে বাকি জানালাগুলো দিয়েও উঁকি দিতে থাকি। মোট কতগুলো, জানা নেই। তবে আমার ডাকে কেউ সাড়া দেয় না। দূর-দূরান্ত অবধি জনমানবের চিহ্নমাত্র নেই। ভাঙাচোরা গাড়ির স্তূপ, বড়ো বড়ো আগাছা আর বাড়ির ছাদে রাখা মাছ ধরার নৌকাগুলোর মাঝে আমার বৃথা চিৎকার নিজের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে। চারিদিকে শুধু ধ্বংসাবশেষ। আমার মধ্যে হঠাৎই একটা বেপরোয়াভাব ভর করে। দমিয়ে রাখা কান্নাটা ফের মাথাচাড়া দেয়।

"আম্মু! আম্মু, তুমি কোথায়?!"

ফোঁপাতে ফোঁপাতে এগিয়ে চলি। শীতল আবহাওয়ায় সাদা ধোঁয়ার মতো দেখতে লাগে আমার প্রতিটা নিঃশ্বাস। পায়ের আঙুলগুলো অবশ হয়ে আসে। কিন্তু গলা, চোখ আর বুকের ভেতর একটা অদ্ভুত উষ্ণতা অনুভব করি।

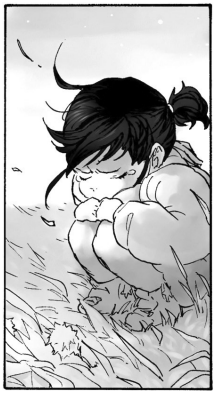

সূর্য ততক্ষণে অস্ত গিয়েছে। একটা স্বচ্ছ হলদে আভা ছড়িয়ে পড়েছে চারপাশে। আমি আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকাই। তারাদের উজ্জ্বলতা বিন্দুমাত্র ফিকে হয়নি। দীর্ঘসময় ধরে পথ চলার ফলে ক্লান্তি ভর করে শরীরে। আগাছাদের মাঝে দুই হাঁটুর ফাঁকে মুখ গুঁজে বসে, গায়ের জ্যাকেটটা আরও ভালোভাবে জড়িয়ে নিই। শরীরের সমস্ত উষ্ণতা কেড়ে নিতে চায় কনকনে বাতাস।

*এ তো সবেমাত্র শুরু।*

ভাবনাটা যখন মাথায় আসে, তখন মনে হয় যেন বহুদূর থেকে নিজেকেই দেখছি।

স্বপ্নটা তখনও শেষ হয় না। দুশ্চিন্তা আর একাকিত্বের ধাক্কায় আমার অনুভূতিগুলো মরে যেতে থাকে। সবকিছু ছেড়ে চলে যেতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু...

পরমুহূর্তেই দূরে কোথা থেকে যেন ক্ষীণ একটা পদশব্দ ভেসে আসে। হাঁটার সময় যেমন খচমচ শব্দ হয়, তেমনটা নয়। ওই মানুষটার পদশব্দে একটা আলাদা প্রশান্তি আছে। আমি হাঁটুর আড়াল থেকে মুখ তুলে তাকাই। শব্দটা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে। উঠে দাঁড়িয়ে অশ্রু মুছে ভালোভাবে দেখার চেষ্টা করি। দূরে, হলদে আভার প্রেক্ষাপটে একজন নারীর অবয়ব চোখে পড়ে। তার ঢিলেঢালা সাদা পোশাক হাওয়ায় উড়ছে। অস্তগামী সূর্যের আলোয় চকচক

করছে তার সোনালি কেশরাশি। রোগাপাতলা, যুবতি সেই নারী তার মুখটা সামান্য ওপরের দিকে তুলে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে।

"সুজুমে।"

আমার নাম ধরে ডাক দেয় সে। ওই মুহূর্তে মনে হয় যেন উষ্ণ পানিতে ধীরে ধীরে ডুবে যাচ্ছি। উষ্ণতাটা ক্রমশ আমার সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। ঝরে পড়া তুষারকণা রূপান্তরিত হয় চেরিফুলের পাপড়িতে।

এ-ই সেই নারী, যাকে আমি এতক্ষণ হন্যে হয়ে খুঁজছিলাম।

"আম্মু," আমার কণ্ঠস্বর ফিসফিসানির মতো শোনায়, কিন্তু ততক্ষণে ঘুম ভেঙে নিজেকে বিছানায় আবিষ্কার করি।

## ছবির মতো সুন্দর মানুষ

এতক্ষণ যা বর্ণনা দিলাম, তার পুরোটাই আমার স্বপ্ন।

সকাল হয়ে গিয়েছে, আর আমি এখনো নিজের বিছানায় শুয়ে রয়েছি। চোখ খোলার পরের কয়েকটা মুহূর্ত পারিপার্শ্বিকতার ধারণা পেতেই কেটে গেল। জানালার বাইরে ঝোলানো উইন্ড চাইমটা টুং টাং শব্দ করছে। সমুদ্রের নোনা বাতাসে দুলছে জানালার পর্দা। আবহাওয়া বেশ স্যাঁতসেঁতে। গালের নিচে নরম বালিশটা অনুভব করতে পারলেও, ঘুমের ঘোরটা এখনও পুরোপুরি কাটেনি। তাই এই অলস সময়টা আরও একটু উপভোগ করার জন্য পুনরায় চোখ বন্ধ করতেই...

"সুজুমে, ঘুম ভাঙল?"

বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠস্বরটা ভেসে এলো সিঁড়ির দিক থেকে। অগত্যা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চেঁচিয়ে সাড়া দিলাম, "হ্যাঁ, যাই!"

স্বপ্নের রেশটুকু এবার পুরোপুরি কেটে গিয়েছে।

"উচ্চ বায়ুচাপের প্রভাবে সমগ্র কিয়ুশুর আকাশ আজ পরিষ্কার থাকবে!"

কিয়ুশুর মানচিত্রের দিকে ইঙ্গিত করে মনোমুগ্ধকর একটা হাসি উপহার দিলো টিভি মিয়াজাকির সঞ্চালিকা।

"খাবারের জন্য ধন্যবাদ," এই বলে একহাতে পাউরুটি আর অন্যহাতে মাখনের চামচ তুলে নিয়ে পাউরুটির ওপর মাখনের প্রলেপ দিতে শুরু করলাম। নিউজ চ্যানেলের ওই সঞ্চালিকা দেখতে বেশ সুন্দর। ফ্যাকাশে গায়ের রং দেখে মনে হয় সে উত্তর জাপানের বাসিন্দা, যেখানে প্রায়শই তুষারপাত হয়। পাউরুটিতে কামড় বসানোর সাথে সাথে মুখজুড়ে ছড়িয়ে পড়ল খাঁটি মাখনের

স্বাদ। *সুস্বাদু।* খাওয়াদাওয়ার বিষয়ে বাড়িতে আমরা বিন্দুমাত্রও কার্পণ্য করি না। সঞ্চালিকার ভাষ্যমতে আজকের দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকবে আঠাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস; যা গতকালের চেয়ে সামান্য কম। তার বাচনভঙ্গি চমৎকার, কোনোরকম আঞ্চলিক ভাষার টান নেই।

"টিফিনটা নিতে ভুলে যেও না আবার," রান্নাঘর থেকে চেঁচিয়ে উঠল তামাকি। তার কণ্ঠস্বরে মিয়াজাকির আঞ্চলিক টান অত্যন্ত প্রকট। একটা সাধারণ কথাও ধমকের মতো শোনায়। প্রতিদিন সকালে আমার জন্য টিফিন বানিয়ে দেয় সে। মাঝেমধ্যে অবশ্য আমি সেটা নিয়ে যেতে ভুলে যাই। যদিও ইচ্ছা করে করি না, কিন্তু যেদিন টিফিন নিতে ভুলে যাই, সেদিন নিজেকে অদ্ভুত রকমের স্বাধীন বলে মনে হয়।

"তুমি একটা অকর্মার ঢেঁকি," গজগজ করতে করতে টিফিন বাক্সে খাবার ভরে দিতে থাকে তামাকি। তার পরনের অ্যাপ্রনের তলা দিয়ে উঁকি দিচ্ছে ঘিয়ে রঙের প্যান্টস্যুট। সবসময়ই সেজেগুজে থাকতে পছন্দ করে সে। পরিপাটি করে ছাঁটা মসৃণ চুল, চকচকে লাল লিপস্টিক দেওয়া ঠোঁট, মুখের মেক-আপ, সেই সাক্ষ্যই বহন করে।

"তা যাই হোক, আজ রাতে আমার বাড়ি ফিরতে একটু দেরি হবে। তুমি কি রাতের খাবার বানিয়ে নিতে পারবে?"

"ডেট-এ যাচ্ছ নাকি?!" মুখভরতি ডিমভাজি গলা দিয়ে নামিয়ে প্রশ্নটা করলাম। "নিশ্চিন্তে যাও, আমাকে নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। যত সময় লাগে লাগুক, মুহূর্তগুলো উপভোগ কোরো!"

"কোনো ডেট-ফেট না—ওভারটাইম আছে!" ঝাঁঝিয়ে ওঠে তামাকি। তার উত্তর শুনে আমার সমস্ত উত্তেজনা নিমেষেই উধাও হয়ে গেল। "মাছ ধরার অনুষ্ঠানটা শুরু হতে আর বেশি দেরি নেই, আমাকে তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিতে হবে। এইযে! এটা নিয়ে যাও।"

এই বলে আমাকে পাহাড়ের মতো ওজনের টিফিন বাক্সটা ধরিয়ে দিল সে।

আকাশ পরিষ্কার, ওই সঞ্চালিকা যেমনটা আশ্বাস দিয়েছিল। বেশ আত্মবিশ্বাসী

ভঙ্গিতে কয়েকটা ঘুড়ি উড়ছে। একেবারে সমুদ্র লাগোয়া একটা পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে সাইকেল চালাচ্ছি আমি। পরনের স্কুল ইউনিফর্মের স্কার্টটা সমুদ্রের নোনা হাওয়ায় আন্দোলিত হচ্ছে। দেখে মনে হয় যেন শ্বাস নিচ্ছে ওটা। আকাশ আর সমুদ্রের পানি অস্বাভাবিক রকমের নীলাভ দেখাচ্ছে। সদ্যোজাত ভেড়ার মতো টুকরো টুকরো মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে আকাশের বুকে। দূরের বাঁধটাকে প্রাচীরের মতো ঘিরে রেখেছে অজস্র গাছপালা। এমন একটা মনোমুগ্ধকর দৃশ্যের মাঝখান দিয়ে আমার সাইকেল চালানোর মুহূর্তটা ক্যামেরাবন্দী করে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছাড়তে পারলে দারুণ হতো। ছবিটা কেমন দেখাবে, সেটা নিজের কল্পনায় ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করলাম: নীল আকাশের পটভূমিকায় রোগপাতলা এক কিশোরী মেয়ে গোলাপী রঙের সাইকেলে চেপে এগিয়ে চলেছে, হাওয়ায় উড়ছে তার উঁচু করে বাঁধা পনিটেইল। *প্রচুর লাইক আর কমেন্ট আসবে...*

হঠাৎ করেই আমার মনটাকে কে যেন এক ঝটকায় বাস্তবে নামিয়ে আনলো। *নিজের দিকে একবার তাকাও। কাজের চিন্তা বাদ দিয়ে যতসব ভুলভাল চিন্তাভাবনা করে চলেছ।*

সমুদ্রের পানির রংটা হঠাতই কেমন যেন ফ্যাকাশে লাগতে শুরু করেছে। মৃদু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমি সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে সামনের দিকে তাকালাম, আর ঠিক তখনই চোখে পড়ল ব্যাপারটা। বিপরীত দিক থেকে কেউ একজন হেঁটে আসছে। দৃশ্যটা বিরল, কারণ শহরের এই উপকণ্ঠ এলাকায় কেউ সাধারণত পায়ে হেঁটে চলাফেরা করে না। প্রাপ্তবয়স্করা একা কিংবা বাচ্চাদের নিয়ে নিজেদের গাড়িতে যাতায়াত করে, আর আমার মতো কিশোর-কিশোরীরা সাইকেল অথবা মপেডে (৫০ সিসির নিচের ক্ষমতার ওজনে হালকা মোটরবাইক)।

আগন্তুক যে একজন পুরুষ, সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। রোগা, লম্বা দেহের গড়ন তার। বড়ো বড়ো চুল আর পরনের ওভারসাইজ শার্ট হাওয়ায় উড়ছে। আলতো করে ব্রেক চেপে আমি সাইকেলের গতি কমাতে শুরু করলাম। যুবকের বয়স আমার থেকে খুব একটা বেশি হবে না। এর আগে কখনো দেখিনি তাকে। *পর্যটক হতে পারে।* তার কাঁধে হাইকিং ব্যাকপ্যাকের মতো কিছু একটা ঝোলানো রয়েছে। মলিন জিন্স পরিহিত লম্বা লম্বা পদক্ষেপে এদিকেই এগিয়ে আসছে সে। মুখের বেশ কিছুটা অংশ ঢেকে রয়েছে বড়ো বড়ো চুলে। এতক্ষণে সে আমার নাগালের মধ্যে চলে এসেছে। আমি আরও জোরে ব্রেক চাপলাম, আর ঠিক সেই মুহূর্তেই দমকা বাতাসের ধাক্কায় চুলগুলো সরে গিয়ে তার মুখাবয়ব উন্মোচিত হলো আমার চোখের সামনে। সূর্যের আলোয় চকচক করে উঠল তার চোখজোড়া।

"কী সুন্দর দেখতে..." নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার আগেই শব্দগুলো আমার মুখ

থেকে বের হয়ে গেল। তার গায়ের রং অত্যন্ত ফরসা, গ্রীষ্মের তাপ যেন কোনো প্রভাবই ফেলতে পারেনি। বড়ো বড়ো চোখের পাতার ছায়া পড়েছে গাল অবধি, আর বাঁ চোখের নিচের ছোটো তিলটা যেন স্বয়ং ঈশ্বর এঁকে দিয়েছেন। খুব ইচ্ছা হলো মানুষটাকে একেবারে কাছ থেকে দেখবার। আমার হৃদযন্ত্রের গতি বেড়ে গেল। এই মুহূর্তে তার সাথে আমার দূরত্ব মোটামুটি পঞ্চাশ সেন্টিমিটারের মতো। আশেপাশের কোনো শব্দ আর আমার কানে আসছে না–

*আমাদের হয়তো আগেও কোথাও দেখা হয়েছে...*

"একটু শুনবে?"

তার শান্ত কণ্ঠস্বরে নম্রতার ছাপ স্পষ্ট। আমি সাইকেল থামিয়ে পেছন ঘুরে তাকালাম। মনে হলো চারপাশের উজ্জ্বলতা যেন বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সরাসরি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে, দাঁড়িয়ে রয়েছে সে।

"এখানে আশেপাশে কোনো পরিত্যক্ত এলাকা আছে কিনা বলতে পারবে?"

"পরিত্যক্ত এলাকা?" এতটাই অন্যমনস্ক ছিলাম যে, কথাটার মানে বুঝতেই বেশ কিছুক্ষণ লেগে গেল।

"হ্যাঁ, আমি আসলে একটা দরজার খোঁজ করছি।"

*দরজা? পরিত্যক্ত কোনো বাড়ির দরজা?*

"...ওই পাহাড়ের দিকে একটা গ্রাম আছে, যেখানে এখন আর কেউ থাকে না। তুমি কি ওটার কথা বলছো...?" খানিকটা দ্বিধা নিয়ে বললাম।

কথাটা শুনে সামান্য হাসলো সে। হাসিটা সুন্দর। আশেপাশের বাতাসে যেন কিছুটা প্রভাব ফেলল সেই হাসি।

"ধন্যবাদ।"

এই বলে সে আমার দেখিয়ে দেওয়া পাহাড়ের দিকে পা বাড়াল, আর একবারের জন্যও পেছন ফিরে তাকাল না।

"...হাহ?" বিস্ময়সূচক শব্দটা মুখ ফসকে বের হয়ে গেল। মাথার ওপর উড়তে থাকা একটা ঘুড়ির ফড়ফড় শব্দ ছাড়া আশেপাশে অন্য আর কোনো শব্দ নেই।

*কথাবার্তাটা আরও কিছুক্ষণ চললে মন্দ হতো না।*

রেলওয়ে ক্রসিংয়ের ঘণ্টাটা ঠিক আমার মাথার ওপরেই একঘেয়ে শব্দ করে বেজে চলেছে। ট্রেন চলে যাওয়ার অপেক্ষা করতে করতে বুঝতে পারলাম আমার হৃদস্পন্দনের হার এখনো স্বাভাবিক হয়নি। জ্বলা-নেভা করতে থাকা লাল বাতিটার দিকে তাকিয়ে আছি। মাথায় ঘুরছে একটাই চিন্তা—*কে ওই যুবক?* একজন সেলিব্রেটি কিংবা মডেলকে সামনাসামনি দেখার পর অনেকটা এমন অনুভূতি হয়। মনে হয় যেন ওরা এই সাধারণ পৃথিবীর পক্ষে একটু বেশিই সুন্দর। অনেকক্ষণ পর্যন্ত একটা অস্থিরতা রয়ে যায় মনের ভেতর।

*...না, তেমনটা নয়, তেমনটা একেবারেই নয়। ওই যুবক একদম অন্যরকম...*

যেন স্ট্রিটল্যাম্পের আলোয় আলোকিত একটা তুষারাবৃত রাস্তা, কিংবা পর্বতের চূড়ায় নেমে আসা প্রথম সূর্যরশ্মি। অনেকটা, আকাশের বুকে ভাসতে থাকা একটা দুধসাদা মেঘের মতো। তার সৌন্দর্য কোনো চেনাজানা মাপকাঠিতে বিচার করা যায় না। আমার কেন জানি না বারবার মনে হচ্ছে সে একটা প্রাকৃতিক দৃশ্য, যা আমি এর আগেও দেখেছি। হ্যাঁ, এটা হলো সেই অনুভূতি, যেমনটা আমি স্বপ্নে অনুভব করি –

"সুজুমে!"

কাঁধে একটা চাপড় খেলাম।

"গুড মর্নিং!"

"ওহ, আয়া। মর্নিং।"

আয়া নিশ্চয়ই আমাকে ধাওয়া করে এসেছে, কারণ ও হাঁপাচ্ছে, আর ওর মুখের ওপর এসে পড়া কালো চুলগুলো দুলছে সেই ছন্দে। দুই কামরার ট্রেনটা দ্রুতগতিতে চলে গেল। বাতাসের ধাক্কায় সামান্য নড়ে উঠল আমার স্কার্ট। ইতোমধ্যেই আরও ছাত্রছাত্রী এসে জড়ো হয়েছে। নিজেদের মধ্যে খোশগল্পে মশগুল তারা। *"গতকালের এপিসোডটা দেখলে?" "আমার তো সেরা লেগেছে... উত্তেজনায় রাতে ঘুম আসেনি।"* তাদের সবাইকে দেখে অত্যন্ত খুশি মনে হচ্ছে।

"এই, কি রে? তোর তো গাল লাল হয়ে আছে," আয়ার চোখে-মুখে খটকা।

"হ্যাঁ?! লাল নাকি? ধুর, মিথ্যে বলিস না তো!" আমি দুহাত দিয়ে গাল চেপে ধরি। উফ্... একেবারে গরম হয়ে আছে!

"হ্যাঁ, সেরকমই তো মনে হচ্ছে। কিছু হয়েছে নাকি?"

চশমার মধ্যে দিয়ে সন্দেহজনক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে ও। কী উত্তর দেব ভাবতে ভাবতেই ঘণ্টাধ্বনি থেমে গেল, খুলে গেল ক্রসিংয়ের গেট। যেন আমাকে বলতে চাইল—তোমার সময় শেষ। অন্য স্কুলপড়ুয়ারা

রেললাইন পার করতে শুরু করেছে।

"...সুজুমে? ঠিক আছো তো?" সামান্য চিন্তিত কণ্ঠে জানতে চাইল আয়া। আমার মাথায় এখনও ওই ছবির মতো সুন্দর যুবকের কথা ঘুরছে। দেজা ভ্যুর মতো অনুভূতিটা আচ্ছন্ন করে রেখেছে মনটাকে।

"এহহে! একটা জিনিস তো বাড়িতেই ফেলে এসেছি!" এই বলে আমি সাইকেলের মুখ ঘোরালাম, এরপর যেদিক থেকে এসেছি, সেদিক উদ্দেশ্য করে প্যাডেলে চাপ দিলাম। পেছন থেকে ভেসে আসছে আয়ার কণ্ঠস্বর, "দাঁড়াও, দাঁড়াও, সুজুমে! তুমি দেরি করে ফেলবে!" প্রখর রোদের মধ্যে পাহাড়ি ঢালের প্রতিকূলে প্যাডেল করতে গিয়ে ঘেমে স্নান করে যাচ্ছি। পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়া একটা ফার্ম ট্রাকের মাঝবয়সি চালক, আমাকে এভাবে স্কুল ইউনিফর্মে স্কুলের বিপরীতে সাইকেল চালাতে দেখে অবাক দৃষ্টিতে তাকাল। কিছুক্ষণের মধ্যেই পিচের মূল রাস্তা ছেড়ে আমি পাহাড়গামী পুরোনো কংক্রিটের রাস্তাটায় নেমে এলাম। প্রায় সাথেসাথেই পঙ্গপালের ডাকের বদলে জায়গা করে নিল সমুদ্রের ঢেউ ভাঙার শব্দ। একটা ঝোপের পাশে সাইকেল রেখে, **প্রবেশ নিষেধ** লেখা ব্যারিকেড টপকে অন্যপাশে চলে এলাম। এরপর একটা বড়ো বড়ো আগাছা ঘেরা প্রায়ন্ধকার সরু রাস্তা ধরে হাঁটা দিলাম চূড়ার দিকে। যতদূর মনে হয়, রাস্তাটা জংলী জানোয়ারদের যাতায়াতের পথ।

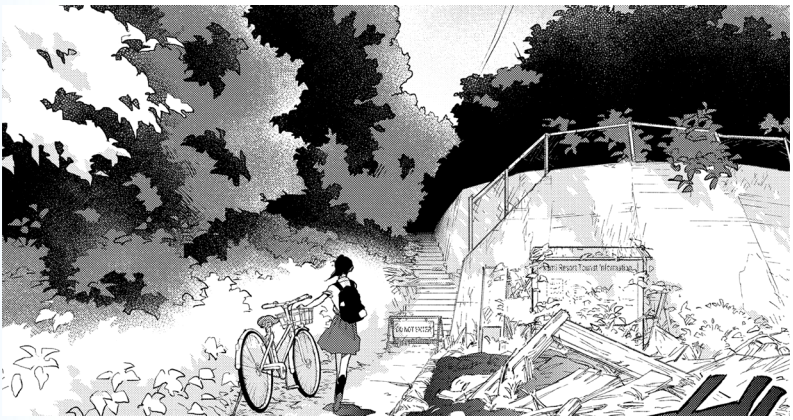

প্রথম পিরিয়ডের ক্লাসে উপস্থিত থাকা যে আর সম্ভব হবে না, তা বুঝতে সমস্যা হলো না। বেশ কিছুটা পথ চলার পর অবশেষে পাহাড়চূড়ার পরিত্যক্ত উষ্ণ-প্রস্রবণ গ্রামটার সামনে পৌঁছে আমি হাঁপাতে লাগলাম।

বাতাসে সালফারের মতো একটা হালকা গন্ধ ভেসে আসছে। শুনেছি আশি-নব্বইয়ের দশকে নাকি এখানে একটা বড়ো উষ্ণ-প্রস্রবণ রিসোর্ট ছিল। তবে

এখন দেখে কোনোভাবেই বোঝা সম্ভব নয় যে একসময় এই জায়গার অর্থনীতি কতটা মজবুত ছিল, নিশ্চয়ই প্রচুর মানুষের সমাগম ছিল সেইসময়। দম্পতি, বড়ো পরিবার কিংবা বন্ধুবান্ধবের দল সময়-সুযোগ পেলেই উষ্ণ পানিতে গোসল, বোলিং, ঘোড়াদের গাজর খাওয়ানো কিংবা *স্পেস ইনভেডার্স*-এর মতো গেম খেলার লোভে এখানে চলে আসতো। এখন অবশ্য এসব বিশ্বাস করা কঠিন। তবে অতীতের প্রাণোচ্ছলতার ছাপ এখনো এদিক সেদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে, তাদের ওপর জন্ম নিয়েছে আগাছার দল। জং ধরা ভেন্ডিং মেশিন, ছেঁড়া লাল লণ্ঠন, রং উঠে যাওয়া উষ্ণ পানির পাইপ, খালি ক্যানের পাহাড়, না খোলা অ্যালকোহলের বোতল আর মাথার ওপরের জট পাকানো তারের জঙ্গল, সেটারই প্রমাণ দেয়। যে ছোট্ট জনপদটায় আমি থাকি, সেখানকার তুলনায় ঢের বেশি জিনিসপত্র রয়েছে এখানে। এমনকি আমার স্কুল যে শহরের মধ্যিখানে অবস্থিত, তার চেয়েও বেশি।

"হ্যালো, তুমি কি এখানে আছো?"

আশেপাশে কাউকে চোখে পড়ল না। পানি, পয়সাকড়ি আর পর্যটক, কোনোটাই আর এখানে অবশিষ্ট নেই। গ্রীষ্মের রোদ পড়ে পরিত্যক্ত জায়গাটাকে বেশ অন্যরকম দেখাচ্ছে। অস্বীকার করার উপায় নেই যে আমার গা-টা ছমছম করতে শুরু করেছে। আগাছাময় পাথুরে পথটা ধরে চলতে চলতে আমি এবার বেশ জোরালো কণ্ঠে ডাক দিলাম, "তুমি কোথায়?"

*এছাড়া আর কীভাবেই বা ডাকতে পারি?* একটা পাথরের তৈরি সেতু পার করে পরিত্যক্ত হোটেলটার সামনে এসে উপস্থিত হলাম, এটাই একসময় রিসোর্টের প্রাণকেন্দ্র ছিল। বৃত্তাকার কংক্রিটের ভবনটা এখানকার অন্যান্য ভগ্নস্তূপের তুলনায় বৃহত্তর।

"আমি আসছি..."

এই বলে আমি হোটেলের ভাঙাচোরা লবিতে পা রাখলাম। এখানে ওখানে বিভিন্ন আকারের পাথরখণ্ড ছড়িয়ে থাকা জায়গাটায় বেশ কয়েকটা জীর্ণ সোফাসেট রয়েছে। জানালার ফ্রেমের সাথে বড়ো বড়ো শতচ্ছিন্ন পর্দাগুলো আটকে রয়েছে কোনোমতে।

"হ্যালো, তুমি কি ভেতরে আছো?"

চারপাশে নজর বোলাতে বোলাতে আমি অন্ধকার হলওয়েটা ধরে এগিয়ে গেলাম। গ্রীষ্মকাল হওয়া সত্ত্বেও মেরুদণ্ড বেয়ে একটা হিমশীতল স্রোত নামতে শুরু করেছে। জায়গাটাকে আমার সহজভাবে নেওয়া উচিত হয়নি। আরও জোরে চিৎকার দিলাম।

"তোমার কি মনে হয় না আমাদের এর আগেও দেখা হয়েছে?"

কথাটা খুবই নাটকীয় শোনাল নিশ্চয়ই।

...আমার এবার ফিরে যাওয়া উচিত। হঠাৎই নিজেকে বোকার হদ্দ মনে হতে লাগল। নিজের এমন কাণ্ডজ্ঞানহীন আচরণের জন্য বেশ বিব্রত বোধ করছি। তাকে খুঁজে বের করে আমি করবটা কী? আমি যদি তার জায়গায় থাকতাম, তাহলে নিশ্চয়ই ব্যাপারটা আমার জন্য বেশ ভীতিপ্রদ হতো। *অত্যন্ত ভীতিপ্রদ,* অনেকটা এই জায়গাটার মতো।

"আমি এখানে!" কিছুটা উৎফুল্ল কণ্ঠে চিৎকার দিলাম, আর ঠিক তখনই কিছু একটা জিনিস নজর কাড়লো আমার।

"...একটা দরজা?"

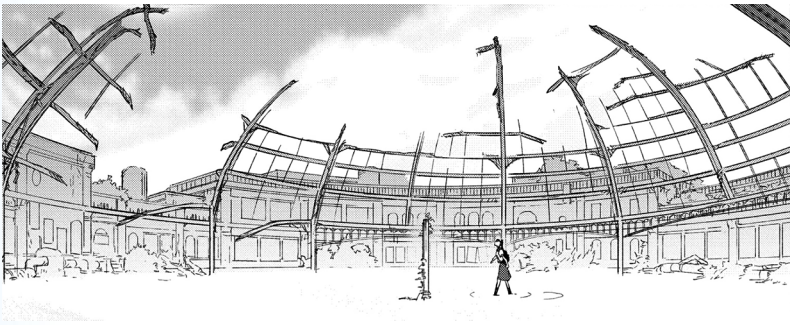

হোটেলের হলওয়ের ওপাশে একটা উঠোনের মতো জায়গা রয়েছে। সেটাকে ঘিরে আছে একটা ভাঙাচোরা গম্বুজের কাঠামো। ওটার ছাদটাই বোধহয় সবার আগে ভেঙে পড়েছিল। কাঠামোটা যতটা জায়গা অধিকার করে রেখেছে, তাতে অনায়াসে একটা একশো মিটার দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করা যাবে। পরিষ্কার পানি জমা হয়ে রয়েছে জায়গাটায়, আর তার মাঝে দাঁড়িয়ে রয়েছে সাদা রঙের একটা দরজা। এই ভগ্নস্তূপের মাঝে দরজাটা যে কীভাবে আস্ত রয়েছে, সে এক রহস্য। ওটার ওপর যেন সময়ের প্রভাব পড়া নিষিদ্ধ। যেভাবেই হোক, দরজাটা ওখানে একা দাঁড়িয়ে রয়েছে।

"সে মনে হয় এমনই একটা দরজার খোঁজ করছিল..." সেদিকে এগিয়ে যেতে যেতে স্বগতোক্তি করলাম। পাথরের সিঁড়ি বেয়ে অর্ধেক নেমে এসে থমকে দাঁড়ালাম আমি। পানিটা বোধহয় বৃষ্টির, আবার এমনও হতে পারে কোনো পাইপ এখনো সক্রিয় রয়েছে। উৎস যা-ই হোক না কেন, ওখানে পানির গভীরতা প্রায় পনেরো সেন্টিমিটার তো হবেই। জুতোজোড়া ভেজানো উচিৎ হবে কিনা ভাবতে ভাবতেই পানিতে পা রাখলাম। বেশ ঠান্ডা। শরীরে একটা শিহরণ খেলে গেল। তবে এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথেই মিলিয়ে যেতে লাগল অনুভূতিটা।

কোনো কারণে আমি সাদা দরজাটার ওপর থেকে চোখ সরাতে পারছি না।

ওটা বেশ পুরোনো। এদিকসেদিক লতাপাতা জন্মেছে। আর কয়েক জায়গায় রং চটে গিয়ে বেরিয়ে পড়েছে বাদামি রঙের কাঠ। লক্ষ করলাম, দরজাটা এক সেন্টিমিটার মতো ফাঁক হয়ে রয়েছে, আর সেই ফাঁকা অংশটা অদ্ভুত রকমের অন্ধকার। *এমন কেন? বাইরে তো রোদ ঝলমল করছে।* বিষয়টা খেয়াল করার পর থেকেই কেমন যেন অস্বস্তি লাগতে শুরু করল। বাতাস বয়ে যাওয়ার দুর্বল শব্দ কানে আসছে। কিছুটা দ্বিধা নিয়েই দরজাটার অতিকায় মুক্তোর মতো হাতলের দিকে হাত বাড়ালাম। একটু মোচড় দিতেই ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দে খুলে গেল পাল্লাটা।

প্রচণ্ড বিস্ময়ে নিজের অজান্তেই ঢোঁক গিলে ফেললাম।

দরজার ওপাশে রাতের অন্ধকার।

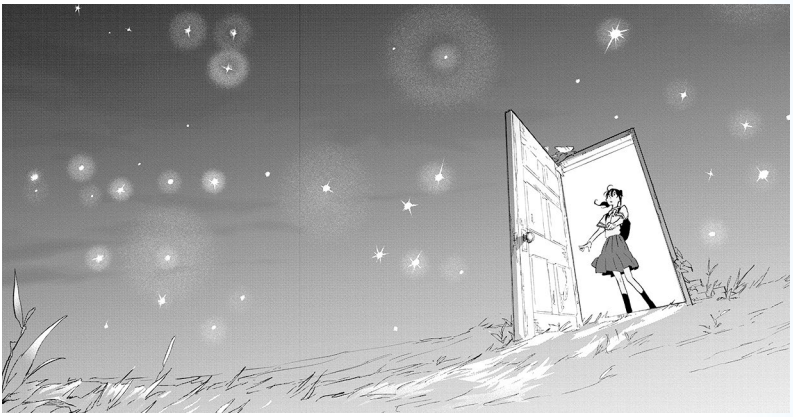

তারায় ভরা আকাশটা অসম্ভব সুন্দর দেখাচ্ছে। দিগন্তরেখা পর্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে সবুজ তৃণভূমি। অন্যদিকে তখন আমার মনের ভেতর স্থান নিয়েছে ভয় আর বিস্ময়ের এক অস্পষ্ট দোলাচল। আমার কি মাথায় গণ্ডগোল দেখা দিল? নাকি স্বপ্ন দেখছি? *জানা উচিৎ ছিল।* বাম পা-টা পানি থেকে তুলে দরজার ওপাশের তৃণভূমিতে পদার্পণ করার চেষ্টা করলাম। কিন্তু যে মুহূর্তে আমার পা ঘাস ছোঁয়ার কথা, ঠিক তখনই – *ঝপাৎ!* পা-টা পুনরায় পানিতে ডুবে গেল।

“একি?!”

দরজার অন্যপ্রান্তে তো দুপুরের এই উঠোনটাই রয়েছে। কোথায় তৃণভূমি? কোথায় সেই তারায় ভরা আকাশ?

“একিইইই?!”

হতবাক দৃষ্টিতে আমি একবার চারিপাশে নজর বুলিয়ে নিলাম। এখনো ওই পরিত্যক্ত হোটেলের মধ্যেই রয়েছি। দরজাটার দিকে ফিরে তাকালাম। দিনের আলোর পটভূমিকায় একটা অন্ধকার আয়তক্ষেত্র।

"এ কীভাবে সম্ভব...?"

সেকথা ভাবতে ভাবতেই যন্ত্রমানবের মতো ফের পা বাড়ালাম ওদিকে। ওই যে দেখা যায় তারায় ভরা আকাশ। কিন্তু আমার এবারের চেষ্টাও সফল হলো না। দরজা পার করলেও ওপারের দুনিয়ায় প্রবেশ করতে পারলাম না। কোনো এক অজ্ঞাত কারণে বারংবার বর্তমানে ফিরে আসছি আমি। এরপর আরও একবার চেষ্টাতেও একই ফল হাওয়ায় অগত্যা হাল ছেড়ে দিলাম। হঠাৎই পায়ের সাথে কিছু একটা জিনিসের ধাক্কা লেগে টং করে শব্দ হলো। চমকে উঠে নিচের দিকে তাকালাম। *...এটা তো মনে হয় একটা* ***জিযো মূর্তি*** (জাপানি নির্মাণশৈলীতে নির্মিত একপ্রকার পাথরের মূর্তি। মূলত জাপানিদের ধর্মাচরণ এবং স্থানীয় বিশ্বাসের সাথে জড়িত), *যেগুলো শহরের দিকে দেখা যায়।* ছোট্ট পাথরের মূর্তিটার মাথার দিকের কিছুটা অংশ পানির ওপর জেগে রয়েছে। শিয়ালের মতো একটা সূচালো মুখ আছে ওটার। এছাড়াও রয়েছে বড়ো বড়ো কান আর সরু চোখ। আমি মোহগ্রস্তের মতো মূর্তিটার দিকে চেয়ে রয়েছি। বাতাসের ফিসফিস কানে আসছে, আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছে যেন। দুহাতে ধরে আমি মূর্তিটাকে পানি থেকে তোলার চেষ্টা করলাম। বলপূর্বক কোনোকিছু উপড়ে ফেলার মতো অনুভূতি হলো অনেকটা। মূর্তিটার পায়ের কাছে কিছুটা বর্ধিত অংশ রয়েছে, যার সাহায্যে হয়তো এটাকে মাটিতে গেঁথে রাখা হয়েছিল।

"বেশ ঠান্ডা..."

মূর্তিটা আসলেই খুব ঠান্ডা। আমার শরীরের উষ্ণতায় ওটার গায়ে লেগে থাকা পাতলা বরফের স্তরটা গলতে শুরু করেছে। ফোঁটা ফোঁটা পানি ঝরে পড়ছে টুপটাপ শব্দে। *এই মধ্যগ্রীষ্মে, এমন একটা পরিত্যক্ত হোটেলে বরফ এলো কোথা থেকে?* আমি দরজাটার দিকে নজর ফেরালাম। বিস্তীর্ণ তৃণভূমি আর তারায় ভরা রাতের আকাশটা একইরকম আছে।

হঠাৎই হাতের তালুতে একটা উষ্ণ, মাংসল উপস্থিতি টের পেয়ে চমকে উঠলাম। তাকিয়ে দেখলাম, পাথরের মূর্তিটা কখন যেন কোনো এক জাদুবলে একটা রোমশ প্রাণীতে রূপান্তরিত হয়েছে।